আলোকিত বিক্রমপুর

মার্চ সংখ্যা থেকে

মার্চের উত্তাল দিনগুলো - ১৯৭১

আলহাজ্ব আঃ রউফ মোল্লা (কমান্ডার)

১৯৭১ সাল বাঙ্গালীদের বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার পূর্ণ প্রস্তুতির বৎসর। এই বৎসরের প্রতিটি দিনই কোন না কোনভাবে তাৎপর্য বহন করে। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসটি বাঙ্গালীর ইতিহাসে খুবই গুরুত্ব বহন করে। মার্চ মাস অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার মাস। দেশ ও জাতির জন্য অকাতরে জীবন বিলিয়ে দেয়ার মাস। এ মাসেই বর্বর-হানাদার বাহিনী ২৫শে মার্চ রাতে ঘুমন্ত বাঙ্গালী জাতির উপর আক্রমণ চালায়। সর্বস্তরের মানুষ ওদের বর্বরতার ও পৈশাচিকতার শিকার হয়। ৭১ সালের দীর্ঘ নয় মাসের মার্চ মাসে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়েই পৃথিবীর বুকে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। তাই ১৯৭১ সালের মার্চ মাসেই উত্তাল দিনগুলি নিয়েই আজকের আমার এই লেখা।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের পুরোপুরি দিনপঞ্জি গুলি তুলে ধরতে না পারলেও আমার স্মৃতি থেকে যতটুকু সম্ভব তুলে ধরব। আমার থানার এক বীর মুক্তিযোদ্ধা মঞ্জুরুল ইসলামের সন্তান ওমর ফারুক রুবেলের অনুরোধেই মার্চের উত্তাল দিনগুলি নিয়েই কিছু আলোকপাত করতে চাই। হাজার বছরের পরাধীন বাঙ্গালী জাতি বিভিন্ন জাতি দ্বারা শাসিত ও শোষিত এই জাতি নিজেদের অস্তিত্বের লক্ষ্যে বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে। তার ধারবাহিকতায় ধর্মের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট পাকিস্তান নামক একটি দেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। আশা ছিল পাকিস্তানের নাগরিক হিসেবে স্বাধীণ সত্বা নিয়ে মাথা উচুঁ করে দাঁড়াতে পারবো। নিশ্চিত হবে তাদের মৌলিক অধিকার। পাকিস্তানের স্বাধীনতা অর্জনের সাথে সাথেই তাদের সেই ভুল ভেঙ্গে গেল। পাকিস্তানীরাই সর্বকালের শাসক শোষক হিসেবে আবির্ভূত হলো। ওরা সর্বদিক থেকেই বাঙ্গালীদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করল। এমনকি আমাদের মায়ের ভাষাকেও কেড়ে নিতে চাইল।

তাই আমাদের পূর্বসূরীদের ১৯৫২ সালে মায়ের ভাষা রক্ষার জন্যও জীবন দিতে হয়েছিল। বাঙ্গালীদের মোহ ভেঙ্গে গেল। তাই স্বাধীন সত্তা নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে পুনরায় বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রাম করতে হয় আমাদের। ৫২ ভাষা আন্দোলন, ৬২ শিক্ষা আন্দোলন, ৬৩ শ্রমিক আন্দোলন, ৬৬ স্বাধীকার/৬ দফার আন্দোলন, ৬৯ গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়েই বাঙ্গালী জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ অভূতপূর্ব বিজয় অর্জন করে। এই অভূতপূর্ব বিজয়ের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু তার সমসাময়িক সকল রাজনৈতিক নেতৃত্বকে অতিক্রান্ত করে বাঙ্গালীদের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে সর্বমহলেই গ্রহণ যোগ্যতা পান। এই নির্বাচন বাঙ্গালীর ইতিহাসে মাইল ফলক হয়ে থাকবে। বিজয়ী

হয়েও বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ পাকিস্তানের ক্ষমতা পেল না। ৬ দফা নিয়ে আলোচনা চলে। জুলফিকার আলী ভুট্টো ৬ দফার আদলে সংবিধান রচনা হলেও পাকিস্তানের অস্তিত্ব থাকেনা বলে জানালেন এবং ইহা কিছুতেই তার দল মেনে নিবে না বলে জানালেন। সামরিক পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৬ দফা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে আলাপ করল এবং কিছু দফার সংশোধন চাইলেন। বঙ্গবন্ধু পরিস্কার ভাষায় বলে দিলেন ৬ দফা এখন বাঙ্গালী জাতির দাবি। এই দাবির দাঁড়ি, কমা পরিবর্তনের অধিকার শেখ মুজিবরের অথবা আওয়ামীলীগের নেই।

বঙ্গবন্ধু ৩রা জানুয়ারী (১৯৭১ইং) রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যাণে) জনসভা করেন। নৌকা আকৃতির বিশাল মঞ্চ বর্তমান শিশু পার্কে করা হয়েছিল। জনসভার প্রারম্ভে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের আওয়ামী লীগের আদর্শ ও ৬ দফা দাবীর প্রতি, বাঙ্গালীর স্বার্থ ও সাংস্কৃতির প্রতি আপোষহীন ও অটল থাকার জন্য শপথ করান। কয়েকদিন পর ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউ অডিটরিয়ামে আওয়ামীলীগের থানা, মহকুমা, জেলা ও কেন্দ্রীয় নেতাদের দু'দিন ব্যাপী সম্মেলন করেন। এই সম্মেলনের শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সমবেত কণ্ঠে ডি.এল রায়ের 'ধন ধাণ্যে পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গান দু'টি পরিবেশন করা হয়। এই সম্মেলন ও গান পরিবেশনে আমাদের মনোবল বেড়ে গেল। ১৮ই জানুয়ারী পাক-প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জেনারেল পীরজাদাসহ বঙ্গবন্ধুর সাথে আলাপ করেন এবং যাবার কালে বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধুকে ভাবী প্রধানমন্ত্রী বলেও উল্লেখ করে গেলেন।

১৩ই ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ৩রা মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। কিন্তু ভুট্টোর ৬ দফার ব্যাপারে মুজিব আপোষ না করলে অধিবেশনে যোগ দিবেন না এবং ঢাকার এই অধিবেশন পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যদের জন্য কসাইখানা হবে বলে উল্লেখ করলেন। জনাব ভুট্টো ৩রা মার্চের অধিবেশন বাতিল/স্থগিত করার দাবী জানালেন। ১লা মার্চ ইয়াহিয়া খান আকস্মিকভাবে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষনে ঘোষণা দেন যে, জাতীয় ঐক্য ও সংহতির স্বার্থে ঢাকায় ৩রা মার্চের জাতীয় সংসদের অধিবেশন বাতিল করা হল। ইয়াহিয়া খানের ঘোষণায় বাঙ্গালীরা তথা হাজার হাজার ছাত্র, জনতা অধিবেশন বাতিলের প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে পড়েন এবং হোটেল পূর্বানীতে বঙ্গবন্ধু তার সহকর্মীদের নিয়ে মিটিং করার মুহুর্তে জনতা বঙ্গবন্ধুকে তাদের সাথে যোগ দেয়ার অনুরোধ করেন। বঙ্গবন্ধু অন্যান্য নেতাদের নিয়ে জনতার কাঁতারে শরিক হন। বঙ্গবন্ধু ইয়াহিয়া খানের ঘোষণার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলতে বললেন। ২রা মার্চ ঢাকাতে, ৩রা মার্চ সারা দেশে হরতাল এবং ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জনসভা ঘোষণা করলেন। ২ থেকে ৬ই মার্চ পর্যন্ত সারা দেশে হরতাল পালিত হলো। ছাত্র জনতার আন্দোলন তীব্রতর হতে থাকে। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় ই,পি,আর ও পুলিশের গুলিতে অনেক ছাত্র, জনতা মৃত্যু বরণ করেন। জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর নিয়োগ দিয়ে ঢাকায় পাঠানো হয় ৫ই মার্চ। কিন্তু গণ আন্দোলনের তীব্রতা ও আওয়ামীলীগের উপর জনগনের পূর্ণ সমর্থন লক্ষ্য করে হাই-কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিএ সিদ্দিক ৬ মার্চ টিক্কা খানকে শপথ গ্রহণ করাতে অস্বীকৃতি জানান। ৫ই মার্চ ইয়াহিয়া খান তার ভাষণে ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন পুনরায় ঘোষণা করেন এবং ১০ই মার্চ ঢাকায় গোল-টেবিল বৈঠকে পাকিস্তানের সকল রাজনৈতিক দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা করে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়ন সম্পর্কিত সমস্যা গুলির সমাধানের চেষ্টা করবেন বলে জানান। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ভাষনের সমালোচনা করে আওয়ামীলীগের পক্ষে একটি ইসতেহার প্রদান করেন। ইসতিহারের শেষাংশে বলা হয়েছিল, 'শহীদের রক্তে রঞ্জিত রাস্তার রক্ত এখনো শুকায়নি। শহীদের পবিত্র রক্ত পদদলিত করে ১০ই মার্চের গোল-টেবিল বৈঠকে আওয়ামীলীগ যোগদান করতে পারে না।'

৭ মার্চ: রেসকোর্স ময়দানে নৌকা আকৃতির সভামঞ্চে সঙ্গবন্ধু এলেন। সকলকেই অভিবাদন জানালেন। প্রায় আধা ঘণ্টার বক্তৃতায় তিনি সবকিছুই বলে ফেললেন। পৃথিবীর ইতিহাসে ৭ই মার্চের ভাষণ শ্রেষ্ঠত্ব

অর্জন করেছে। এ ধরনের ভাষন কোন নেতা কোথায় দিয়েছে বলে আমার জানা নেই। কবিতার ছন্দের মত চয়ন গুলো আওরিয়ে গেলেন। ভাষনের আগা-গোড়ায় কোন ছন্দ পতন নেই, নেই কোন জড়তা। ওদের প্রতি রইল হুঁশিয়ারী 'আর যদি একটি গুটি চলে, আর যদি আমার কোন লোককে হত্যা করা হয়, তবে.....তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রাই'। সেনাবাহিনী ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া এবং হত্যার তদন্তের দাবী করলেন। খাজনা, ট্যাক্স, বন্ধ করে দেয়া, সরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাষিত প্রতিষ্ঠান, মিল, কল-কারখানা বন্ধ করার ঘোষণা দিলেন। পাকিস্তানীদের সর্বোত ভাবেই অসহযোগীতা করার আহ্বান জানালেন। বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যেতে নির্দেশ দিলেন। আমাদের সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিলেন। ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তুলতে বললেন, যার যা কিছু আছে তা নিয়ে প্রস্তুত থাকতে বললেন। তিনি হুকুম দিতে না পারলেও যেন আমরা কাহারও হুকুমের অপেক্ষায় না থাকি তার নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দিব, তবুও এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।' তিনি আরও বলেন, 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' বঙ্গবন্ধু জয়বাংলা শ্লোগান দিলে জনতা জয় বাংলা ধ্বনিতে চারদিক মুখরিত করে তোলে। 'খোদা হাফেজ' বলে তার বক্তৃতা শেষ করেন। এই ভাষনের পর অসহযোগ আন্দোলন চলছে। তার নির্দেশেই সবকিছু চলছে। ছাত্র লীগের থানার কর্মকর্তা থাকার সুবাদে বিশাল মিছিল নিয়ে রেসকোর্স ময়দানে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ছাত্র লীগের কর্মী থাকায় বঙ্গবন্ধু ঘোষিত সকল কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত ছিলাম। ৯ই মার্চ পল্টনের জনসভায় মাওলানা ভাষানী ইয়াহিয়া খানকে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিলেন, 'অনেক হয়েছে আর নয়। তিক্ততা বাড়াইয়া আর লাভ নাই। লাকুম দ্বী-নুকুম ওলিয়া দ্বীন (তোমাদের ধর্ম তোমাদের কাছে আমাদের জন্য আমাদের ধর্ম পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা স্বীকার করে নাও। মুজিবের কথামত ২৫শে মার্চ কিছু করা না হলে আমি শেখ মুজিবের সাথে হাত মিলাব।'খামাখা কেউ মুজিবকে অবিশ্বাস করবেন না। আমি মুজিবকে ভাল করে চিনি। বাঙ্গালীর স্বার্থের পরিপন্থি কোন কাজ মুজিব করতে পারে না।' ১৫ মার্চ সকালে ইয়াহিয়া খান তার সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের নিয়ে ঢাকায় আসেন। ১৬ মার্চ ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠক হয়। ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু তার পরামর্শ দাতাদের নিয়ে ইয়াহিয়ার সঙ্গে বৈঠক করেন।

২১ মার্চ বঙ্গবন্ধু বলেন, 'সাড়ে সাত কোটি মানুষের দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করা যাবে না।' ইয়াহিয়া খান ২৫শে মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য বাতিল ঘোষণা করলেন। বঙ্গবন্ধু সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরও বেগবান করার লক্ষ্যে ২৬শে মার্চ থেকে সারাদেশ ব্যাপী 'অবরোধ' আন্দোলন শুরু করার আহ্বান জানান।

২৩ মার্চ সকাল দশটায় ছাত্রলীগের পল্টন ময়দানের জনসভায় 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি' গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে বাজিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করলেন ছাত্র লীগের চার নেতা নূরে আলম সিদ্দিকী, আব্দুল কুদ্দুস মাখন, আসম আব্দুর রব ও শাজাহান সিরাজ। সভা শেষে চার নেতা বিশাল মিছিল সহকারে বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাসায় এসে বঙ্গবন্ধুকে পতাকাটি অর্পন করেন এবং সামরিক কায়দায় তাকে অভিবাদন জানান।

২৫ মার্চ সকল নেতা কর্মীর মধ্যেই উদ্বেগ উৎকণ্ঠার ছাপ দেখা গেল। বঙ্গবন্ধু তার সাথে সাক্ষাত করতে আসা নেতা কর্মীদের নিরাপদ স্থানে যাওয়ার ও সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়ে বিদায় করলেন। বিকাল ৩টার পর লন্ডনস্থ আওয়ামীলীগের নেতা জাকারিয়া চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে গোপন আলাপ করেন এবং ঐ রাতেই বর্ডার পার হয়ে লন্ডন চলে যান। রান সাড়ে এগারটায় 'ঝন্টু' নামক এক যুবক বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করতে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'মুজিব ভাই, পাকিস্তানী আর্মিরা আপনাকে মারতে আসছে, আপনি এক্ষুনি বাসা ছেড়ে অন্যত্র চলে যান। পাকিস্তানী আর্মিরা ট্যাংক, কামান ও ভারী অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ইতিপূর্বেই ঢাক শহরে প্রবেশ করার জন্য তৈরী হয়েছে। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল, জগন্নাথ হল, রাজার বাগ পুলিশ হেড কোয়ার্টার এবং ই.পি.আর বাহিনীর পীলখানার সদর দপ্তরে সশস্ত্র

আক্রমণ চালাবে। রেডিও স্টেশন, টেলিভিশন কেন্দ্র, টেলিকমিউনিকেশন কেন্দ্র ও ঢাকার ফুড গোডাউনের দখল নিবে।' বঙ্গবন্ধু ড. ওয়াজেদকে, হাসিনা, রেহানা ও জেলীকে নিয়ে ভাড়াকৃত ফ্ল্যাটে যেতে বললেন। বঙ্গবন্ধুকে যাওয়ার অনুরোধ করলে তিনি বললেন, 'আমার কোথাও যাওয়ার উপায় নাই। পাক সেনারা আমাকে মারতে চাইলে আমার বাসায় মারতে পারবে। তোমরা নিরাপদে চলে যাও।' অগত্যা কিছুই করার নেই। বঙ্গবন্ধুকে রেখে তারা চলে গেলেন। ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে পাকিস্তানী বর্বর বাহিনীর পশ্চিমা বেনিয়া কুকুররা ২৫শে মার্চের রাতে বাংলার ঘুমন্ত নিরিহ মানুষের উপর চালালো নির্মম হত্যাকান্ড। বঙ্গবন্ধু অবস্থা বুঝতে পেরে তার অনুসারী সকলকেই নিরাপদে যেতে বললেন। বঙ্গবন্ধু ২৫শে মার্চ রাত ১২টা ২০ মিনিটে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তার অল্পক্ষণ পরেই তিনি পাকিস্তান বাহিনীর হাতে বন্দী হন এবং তাকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়।

বাংলার বুকে পশ্চিমা বেনিয়া কুকুরেরা যখন হত্যাযজ্ঞ চালালো, রাতের অন্ধকারে মেশিন গান, স্টেনগান, রাইফেল ও ব্যাওনেটের চার্জে যখন বাংলার রাজপথ রক্তের বন্যায় প্লাবিত হয়ে গেল। এদেশের কৃষক, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতী, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র-শিক্ষক ওদের শিকার হল। আমাদের মা-বোনেরা হল ওদের ভোগের সামগ্রী। তখন বাংলার শান্ত যুবক, শ্রমীক প্রতিরোধ ও প্রতিশোধের নেশায় সিংহের ন্যায় গর্জন করে উঠল। যাদের জীবনের ব্রত ছিল কোমলতা, তারাই লৌহ ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে উঠল। চারদিকে পাক-সেনাদের আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যবস্থা হয় এবং বিভিন্নভাবে ব্যারিকেট দিয়ে ওদের চলায় বাঁধার সৃষ্টি করা হয়। বহুলোক নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য শহর ছেড়ে গ্রাম-গঞ্জের জনপদে আশ্রয় নেয়। আগতদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা একজন ছাত্র লীগের কর্মী হিসেবে ইবাদতের অংশ হিসেবেই আমি মনে করেছিলাম।

বঙ্গবন্ধু ২৫শে মার্চ গভীর রাত্রে (ইংরেজী ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী ২৬শে মার্চ শুরু হয়ে গেছে) স্বাধীনতা ঘোষনাটি বেতার যোগে পাঠানোর জন্য তিনি সেন্ট্রাল টেলিগ্রাম অফিসে তার এক বন্ধুকে ডিকটেশন দিলেন। চট্টগ্রাম আওয়ামীলীগ নেতা এমএ হান্নানের কাছে এই ঘোষণা যথাসময়ে পৌঁছেছিল। জনাব হান্নান যথাসময়েই ঘোষনা প্রচার করেন। আমাদের মুন্সিগঞ্জের আওয়ামীলীগ নেতা তারা মিয়া রিকশায় সারা শহর মাইকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ২৬শে মার্চ সকাল থেকেই। তারপর পরিস্থিতি দ্রুত অবনতি ঘটলে অবস্থার মোকাবেলায়, স্টাফ আর্টিষ্ট বেলাল মোহাম্মদের নেতৃত্বে জনাকয়েক দুঃসাহসী বেতার কর্মী বন্দর নগরীর অপর প্রান্তে কালুর ঘাট ট্রান্সমিটার সংযোজন করে বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপন করেন। ২৬শে মার্চ সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিটে ঐতিহাসিক বেতার কেন্দ্র থেকে স্বল্পকালীন অনুষ্ঠান শুরু করেন। এই অনুষ্ঠান থেকেই সর্ব প্রথম বঙ্গবন্ধুর প্রেরিত ঘোষণাটির বাংলা অনুবাদ পাঠ করেন অধ্যাপক আবুল কাশেম সন্দীপ। ২৭শে মার্চ বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সন্ধ্যাকালীন অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পত্র পাঠ করেন মেজর জিয়াউর রহমান। মেজর জিয়ার ঘোষণা পত্র পাঠে জাতি আশার আলো দেখতে পেল। স্বাধীনতা কামী মানুষের মধ্যে সাহস ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল। সেনাবাহিনীর একজন মেজর'র ঘোষণা পত্র পাঠে জাতি আশান্বিত হয়েছি।

একদিকে যুদ্ধে যাবার আহ্বান, অপরদিকে বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত শরনার্থীদের আশ্রয় ও নিরাপত্তার মহান দায়িত্ব। এমনি ব্যস্ত মূহুর্তে দিনটি ঠিক মনে নেই ২৮/২৯শে মার্চ হবে, আমার টঙ্গীবাড়ী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। মজিবুর রহমান আমার নিকট একটি চিরকুট পাঠিয়েছেন। তাতে লিখা 'রউফ সাহেব, পাকসেনারা গানবোর্ড নিয়ে আব্দুল্লাহপুর আসছে। ওদের প্রতিহত করতে হবে। আপনি লোকজন নিয়ে আব্দুল্লাহপুর ঘাটে চলে আসেন।' আমি আউটশাহী তহসিল অফিস থেকে বন্দুক নিয়ে আমার সঙ্গীসাথী বন্ধুদের নিয়ে আব্দুল্লাহপুর ঘাটে এসে দেখি থানার বিভিন্ন এলাকার আওয়ামীলীগ, ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ, থানার পুলিশ, আনসার, চৌকিদারসহ হাজার হাজার লোক গানবোর্ড আক্রমনের জন্য বাঁশের লাঠি, জুতা, ঢেডা, বন্দুক, রাইফেল নিয়ে উপস্থিত। বাংকার করা হল। দূর্ধর্ষ পাকবাহিনীর গানবোর্ড আক্রমনের জন্য

আমাদের এসব অস্ত্র কোন কাজেই আসবে না। এ কথাটি তখন মনেই হয়নি জনগনের স্বতস্ফূর্ততা দেখে। জনতার মনোবলের কাছে পরাজিত হবে ওদের অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র। যাই হোক সারা রাত অপেক্ষায় থাকলো হাজার হাজার মানুষ। কিন্তু পাক সেনাদের গানবোর্ড এলো না। ফলে সকালে যার যার গন্তব্যে চলে গেলাম।

এপ্রিলের মাঝামাঝি হবে, দিনটি ঠিক মনে নেই, ট্রেনিং এর জন্য ভারতের আগর তলায় গেলাম। আসামের লোহার বন্ধের প্রথম ব্যাচে ট্রেনিং নিলাম। মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং সমাপ্তের পর জে, এল, ডব্লিউ ট্রেনিং (জুনিয়র লিডার উইংস) নিই। জে এল ডব্লিউ ট্রেনিংয়ে ভারতের সেনাবাহিনীর উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। লোহার বন্দের ট্রেনিং সমাপ্ত করে ৪ নং সেক্টরের অধীনে সিলেটের কানাই ঘাট থানায় আসি। বেশ কয়েকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি। যুদ্ধ জয়ের আনন্দ ও সাথী-বন্ধু হারানোর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সবই আছে এখনো আমার স্মৃতিচারণে। সিলেটে ৪টা সেপ্টেম্বর নিজাম ভাইকে হারিয়েছি। ২২শে সেপ্টেম্বর আহম্মদুল্লা, শরিফ ও বেলুচিকে হারিয়েছি। ওদের মৃত্যুর স্বাক্ষর হয়েই বেঁচে রইলাম। তারপর বাতাকান্দির যুদ্ধ, টঙ্গীবাড়ি থানা দখল করে ক্যাপ্টেন হালিম চৌধুরীর বহরে শরিক হলাম। ১৬ই ডিসেম্বরের চূড়ান্ত বিজয়ের মূহুর্তে তার অধীনে গ্রুপ কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেছি।

দীর্ঘ ৯ মাসের যুদ্ধ। চারিদিকে পাক হানাদারদের নির্যাতন। ৩০ লাখ শহীদ। এবং অসংখ্য মা বোনে ইজ্জতের বিনিময়ে ধরা দেয় বহু কাঙ্ক্ষিত এই স্বাধীনতা। তাই বলতে চাই, এই স্বাধীনতা কারো দয়ার দান নয়। কারো দেয়া রূপার থালার উপহারও নয়। এই স্বাধীনতা অর্জন করতে অনেক আন্দোলন সংগ্রাম করতে হয়েছে। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ৩০ লক্ষ শহীদ, ৩ লক্ষ মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময়ে, অগনিত মানুষের সীমাহীন কষ্টের ফলেই না এই স্বাধীনতা। গুটি কয়েক লুটেরা, দূর্নীতিবাজ, ভূমিদস্যু, সন্ত্রাসী, অসৎ রাজনীতিকের জন্য স্বাধীনতার চেতনায় বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে পারে না। ওদের করাল গ্রাস থেকে জাতিকে মুক্ত করে স্বাধীনতার চেতনায় বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে হবে। স্বাধীনতার স্বাদ প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। সুখি ও সমৃদ্ধশালী জনকল্যাণ মূলক বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারলেই স্বার্থক হবে মুক্তিযুদ্ধের, শান্তি পাবে শহীদদের আত্মা। তাই বলতে চাই, 'আমরা যে স্বাধীনতা পেয়েছি তা লোনাজলে সিক্ত, এর স্বাদ লোনা, অশ্রুসিক্ত, পরিজনের বিয়োগ-ব্যাথার। এই স্বাধীনতা রক্ষার্থে প্রয়োজনে পুনরায় জেগে উঠতে হবে বর্তমান প্রজন্মকে। কেবলমাত্র তারাই পারে আমাদের বহু কষ্ট এবং রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা রক্ষা করতে।

লেখক পরিচিতি:
আলহাজ্ব আব্দুর রউফ মোল্লা (কমান্ডার)
মুন্সিগঞ্জ জেলাধীন টঙ্গীবাড়ী উপজেলার আউটশাহী ইউনিয়নের সন্তান।
ভাইস চেয়ারম্যান: বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা পরিষদ।
চেয়ারম্যান: মুন্সিগঞ্জ জেলা মুক্তিযোদ্ধা ফাউন্ডেশন।
ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক: মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুর সমিতি।
কার্য-নির্বাহী পরিচালক: ক্যাপিটাল জেনারেল হাসপাতাল লি.।

Published on Munshigonj.com dated 17th March, 2008